কল্পনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

সুহৃৎকরকমলে

বৈশাখ

১৩০৭

সূচীপত্র

কল্পনা

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
　　সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
　　যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
　　দিক্‌-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
　　এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এ নহে মুখর বনমর্মরগুঞ্জিত,
　　এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুমরঞ্জিত,
　　ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে;
কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
　　কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
　　এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে ;
বিশ্বজগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে ;
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া ;
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া ;
বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
'এসো এসো' সুরে করুণ-মিনতি-মাখা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন ;
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন ;
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ-রচনা।

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

১৫ বৈশাখ ১৩০৪
জোড়াসাঁকো। কলিকাতা

বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর-সরসা।
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে।
নিখিলচিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা!

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—

এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী!
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার-রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত-বয়নে—
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে;
শশীতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী—
কোথা তোরা পুরকামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী।
শূন্য শয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী!

যূথীপরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরি তমালকুঞ্জতিমিরে—
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা—
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

১৭ বৈশাখ ১৩০৪

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা

চৌরপঞ্চাশিকা

ওগো সুন্দর চোর,
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যায়
কনকচাঁপার ডোর!
কত বসন্ত চলি গেছে হায়,
কত কবি আজি কত গান গায়,
কোথা রাজবালা চিরশয্যায়
ওগো সুন্দর চোর—
কোনো গানে আর ভাঙে না যে তার
অনন্ত ঘুমঘোর!

ওগো সুন্দর চোর,
কত কাল হল কবে সে প্রভাতে
তব প্রেমনিশি ভোর!
কবে নিবে গেছে নাহি তাহা লিখা
তোমার বাসরে দীপানলশিখা,
খসিয়া পড়েছে সোহাগলতিকা,
ওগো সুন্দর চোর—
শিথিল হয়েছে নবীন প্রেমের
বাহুপাশ সুকঠোর।

তবু সুন্দর চোর,
মৃত্যু হারায়ে কেঁদে কেঁদে ঘুরে
পঞ্চাশ শ্লোক তোর।
পঞ্চাশ বার ফিরিয়া ফিরিয়া
বিদ্যার নাম ঘিরিয়া ঘিরিয়া
তীব্র ব্যথায় মর্ম চিরিয়া
ওগো সুন্দর চোর,
যুগে যুগে তারা কাঁদিয়া মরিছে
মূঢ় আবেগে ভোর।

ওগো সুন্দর চোর,
অবোধ তাহারা, বধির তাহারা,
অন্ধ তাহারা ঘোর।
দেখে না শোনে না কে আসে কে যায়,
জানে না কিছুই কারে তারা চায়,
শুধু এক নাম এক সুরে গায়
ওগো সুন্দর চোর—
না জেনে না বুঝে ব্যর্থ ব্যথায়
ফেলিছে নয়নলোর।

ওগো সুন্দর চোর,
এক সুরে বাঁধা পঞ্চাশ গাথা
শুনে মনে হয় মোর—

রাজভবনের গোপনে পালিত
রাজবালিকার সোহাগে লালিত
তব বুকে বসি শিখেছিল গীত
ওগো সুন্দর চোর,
পোষা শুক শারী মধুরকণ্ঠ
যেন পঞ্চাশ জোড়।

ওগো সুন্দর চোর,
তোমারি রচিত সোনার ছন্দ-
পিঞ্জরে তারা ভোর।
দেখিতে পায় না কিছু চারি ধারে,
শুধু চিরনিশি গাহে বারে বারে
তোমাদের চিরশয়নদুয়ারে
ওগো সুন্দর চোর—
আজি তোমাদের দুজনের চোখে
অনন্ত ঘুমঘোর।

২৩ বৈশাখ ১৩[illegible]
পরিবর্ধন : ৮ জ্যৈষ্ঠ। কলিকাতা

স্বপ্ন

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।

মহাকাল-মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি— ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য-'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।

প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।

তোরণের শ্বেতস্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে।

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো, সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগরগুঞ্জনক্লান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে— মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি,
'হে বন্ধু, আছ তো ভালো?' মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু- কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি— নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত— মনে নাহি আর।

দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহা-পানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণকরে, কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো; মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে, ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

বোলপুর

মদনভস্মের পূর্বে

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে,
মরি মরি অনঙ্গদেবতা।
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধুপবনে,
পথিকবধূ চরণে প্রণতা।
ছড়াত পথে আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ তরুণী,
বকুলবনে পবন হত সুরার মতো সুরভি—
পরান হত অরুণবরনি।

সন্ধ্যা হলে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে
জ্বালায়ে দিত প্রদীপ যতনে,
শূন্য হলে তোমার তূণ বাছিয়া ফুলমুকুলে
সায়ক তারা গড়িত গোপনে।
কিশোর কবি মুগ্ধছবি বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা রচিত রাগিণী।
হরিণ-সাথে হরিণী আসি চাহিত দীননয়ানে,
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনি।

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি করিত মিনতি।

পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি
পরশছলে খেলিত যুবতী।
শ্যামল তৃণশয়নতলে ছড়ায়ে মধুমাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী—
নূপুরদুটি বাজাত লালসে।

কাননপথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরি
রহিত চাহি আকুলনয়নে।
বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি হাসিতে—
শরমে বালা উঠিত জাগিয়া,
শাসনতরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া।

তেমনি আজো উদিছে বিধু, মাতিছে মধুযামিনী,
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে।
বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী
মলয়ানিলশিথিল দুকূলে।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখিরে,
মাঝেতে বহে বিরহবাহিনী।
গোপন-ব্যথা-কাতরা বালা বিরলে ডাকি সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী।

এসো গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে,
এসো গোপনে মৃদু চরণে বাসরগৃহ-দুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।
এসো চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে—
নবীন করো মানব-ঘর, ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ-সরস-পরশে।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মদনভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী—
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতিবিলাপসংগীতে,
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন-মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মুরছি পড়ে অবনী।

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়বীণাযন্ত্রে মহাপুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরুপল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা।

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।

বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে।
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী—
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মার্জনা

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।
ভীরু পাখির মতন তব পিঞ্জরে এসেছি,
ওগো, তাই বলে দ্বার কোরো না রুদ্ধ কোরো না।
মোর যাহা কিছু ছিল কিছুই পারি নি রাখিতে,
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারি নি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখো ঢাকো, তুমি করো মোরে করুণা—
ওগো, আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালোবাসিতে
তবু ভালোবাসা কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।
তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়া-পানে চেয়ো না বন্ধু, চেয়ো না।
আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত শরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি দু হাতে ঢাকিব নগ্নহৃদয়বেদনা—
ওগো প্রিয়তম, তুমি অভাগিরে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

ওগো প্রিয়তম, যদি চাহ মোরে ভালোবাসিয়া
মোর সুখরাশি কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

যবে সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া
তুমি দূর হতে বসি হেসো না গো সখা, হেসো না।
যবে রানীর মতন বসিব রতন-আসনে,
যবে বাঁধিব তোমারে নিবিড়প্রণয়শাসনে,
যবে দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা,
ওগো, তখন হে নাথ, গরবিয়ে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪
বোলপুর

চৈত্ররজনী

আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো
চৈত্রনিশীথশশী।
তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে
কী দেখিছ একা বসি,
চৈত্রনিশীথশশী।
কত নদীতীরে, কত মন্দিরে,
কত বাতায়নতলে—
কত কানাকানি, মন-জানাজানি,
সাধাসাধি কত ছলে।
শাখাপ্রশাখার, দ্বার-জানালার
আড়ালে আড়ালে পশি
কত সুখদুখ কত কৌতুক
দেখিতেছ একা বসি,
চৈত্রনিশীথশশী।

মোরে দেখো চাহি, কেহ কোথা নাহি—
শূন্য ভবনছাদে
নৈশ পবন কাঁদে।
তোমারি মতন একাকী আপনি
চাহিয়া রয়েছি বসি,
চৈত্রনিশীথশশী।

১৯ বৈশাখ ১৩০৪
জোড়াসাঁকো। কলিকাতা

স্পর্ধা

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।'
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু, 'যাও।'
সখী, ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি—
তবু সে গেল না চলি।

দাঁড়ালো সমুখে, কহিনু তাহারে, 'সরো।'
ধরিল দু হাত, কহিনু, 'আহা, কী কর।'
সখী, ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে—
তবু ছাড়িল না মোরে।

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছিমিছি—
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, 'ছি ছি।'
সখী, ওলো সখী, কহিনু শপথ ক'রে—
তবু সে গেল না স'রে।

অধরে কপোল পরশ করিল তবু—
কাঁপিয়া কহিনু, 'এমন দেখি নি কভু।'
সখী, ওলো সখী, এ কী তার বিবেচনা—
তবু মুখ ফিরালো না।

আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল—
কহিনু তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল!'
সখী, ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়—
মিছে তারে অনুনয়।

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে।
সখী, ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁখিনীরে—
কেন সে এল না ফিরে!

১৩০৪

পিয়াসি

আমি তো চাহি নি কিছু।
বনের আড়ালে দাঁড়ায়ে ছিলাম
নয়ন করিয়া নিচু।
তখনো ভোরের আলস-অরুণ
আঁখিতে রয়েছে ঘোর,
তখনো বাতাসে জড়ানো রয়েছে
নিশির শিশিরলোর।
নূতন তৃণের উঠিছে গন্ধ
মন্দ প্রভাতবায়ে,
তুমি একাকিনী কুটিরবাহিরে
বসিয়া অশথছায়ে
নবীন-নবনী-নিন্দিত করে
দোহন করিছ দুগ্ধ—
আমি তো কেবল বিধুর বিভোল
দাঁড়ায়ে ছিলাম মুগ্ধ।

আমি তো কহি নি কথা।
বকুলশাখায় জানি না কী পাখি
কী জানালো ব্যাকুলতা।

আম্রকাননে ধরেছে মুকুল,
ঝরিছে পথের পাশে ;
গুঞ্জনস্বরে দুয়েকটি ক'রে
মৌমাছি উড়ে আসে।
সরোবরপারে খুলিছে দুয়ার
শিবমন্দির-ঘরে ;
সন্ন্যাসী গাহে ভোরের ভজন
শান্ত গভীর স্বরে।
ঘট লয়ে কোলে বসি তরুতলে
দোহন করিছ দুগ্ধ—
শূন্য পাত্র বহিয়া মাত্র
দাঁড়ায়ে ছিলাম লুব্ধ।

আমি তো যাই নি কাছে।
উতলা বাতাস অলকে তোমার
কী জানি কী করিয়াছে।
ঘণ্টা তখন বাজিছে দেউলে,
আকাশ উঠিছে জাগি ;
ধরণী চাহিছে ঊর্ধ্বগগনে
দেবতা-আশিস মাগি।
গ্রামপথ হতে প্রভাত-আলোতে
উড়িছে গোখুরধূলি ,
উছলিত ঘট বেড়ি কটিতটে
চলিয়াছে বধূগুলি।

তোমার কাঁকন বাজে ঘনঘন
ফেনায়ে উঠিছে দুগ্ধ—
পিয়াসি নয়নে ছিনু এক কোণে
পরান নীরবে ক্ষুব্ধ।

১৩০৪

পসারিনি

ওগো পসারিনি, দেখি আয়
কী রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি
কোমল করুণ ক্লান্তকায়।
কোথা কোন্ রাজপুরে যাবে আরো কত দূরে
কিসের দুরূহ দুরাশায়।
সম্মুখে দেখো তো চাহি পথের যে সীমা নাহি,
তপ্ত বালু অগ্নিবাণ হানে।
পসারিনি, কথা রাখো, দূর পথে যেয়ো নাকো,
ক্ষণেক দাঁড়াও এইখানে।

হেথা দেখো শাখা-ঢাকা বাঁধা বটতল,
কূলে কূলে ভরা দিঘি, কাকচক্ষু জল।
ঢালু পাড়ি চারি পাশে কচি কচি কাঁচা ঘাসে
ঘনশ্যাম চিকন-কোমল।
পাষাণের ঘাটখানি, কেহ নাই জনপ্রাণী,
আম্রবন নিবিড় শীতল।
থাক্ তব বিকিকিনি, ওগো শ্রান্ত পসারিনি,
এইখানে বিছাও অঞ্চল।

ব্যথিত চরণ দুটি ধুয়ে নিবে জলে,
বনফুলে মালা গাঁথি পরি নিবে গলে।
আম্রমঞ্জরীর গন্ধ বহি আনি মৃদুমন্দ
বায়ু তব উড়াবে অলক;
ঘুঘু-ডাকে ঝিল্লিরবে কী মন্ত্র শ্রবণে কবে,
মুদে যাবে চোখের পলক।
পসরা নামায়ে ভূমে যদি ঢুলে পড় ঘুমে,
অঙ্গে লাগে সুখালস-ঘোর,
যদি ভুলে তন্দ্রাভরে ঘোমটা খসিয়া পড়ে,
তাহে কোনো শঙ্কা নাহি তোর।

যদি সন্ধ্যা হয়ে আসে, সূর্য যায় পাটে,
পথ নাহি দেখা যায় জনশূন্য মাঠে—
নাই গেলে বহু দূরে বিদেশের রাজপুরে,
নাই গেলে রতনের হাটে।
কিছু না করিয়ো ডর, কাছে আছে মোর ঘর,
পথ দেখাইয়া যাব আগে—
শশিহীন অন্ধ রাত, ধরিয়ো আমার হাত
যদি মনে বড়ো ভয় লাগে।
শয্যা শুভ্রফেননিভ স্বহস্তে পাতিয়া দিব,
গৃহকোণে দীপ দিব জ্বালি—
দুগ্ধদোহনের রবে কোকিল জাগিবে যবে
আপনি জাগায়ে দিব কালি।

ওগো পসারিনি,

মধ্যদিনে রুদ্ধ ঘরে সবাই বিশ্রাম করে,

দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি।

দাঁড়াও, যেয়ো না আর— নামাও পসরাভার,

মোর হাতে দাও তব ডালি।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

শিলাইদহ। বোট

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে।
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময়ে অরুণধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'

গোধূলিবেলায় তখনো জ্বলে নি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ,
কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন মনে।
হেনকালে এল সন্ধ্যাধূসর পথে
করুণনয়ন তরুণ পথিক রথে।

ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
ক্লান্তচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'

ফাগুনযামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে,
দখিন-বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
দুয়ারসমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
রয়েছি বিজন রাজপথ-পানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭
বোলপুর

প্রণয়প্রশ্ন

এ কি তবে সবই সত্য
হে আমার চিরভক্ত ?
আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য ?
আমার মধুর অধর, বধূর
নবলাজসম রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?

চিরমন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি ?
চরণে আমার বীণাঝংকার বাজে কি ?
এ কি সত্য ?
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া ?
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া,
এ কি সত্য ?
তপ্তকপোল-পরশে অধীর
সমীর মদিরমত্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?

কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
মরণবাঁধন মোর দুই ভুজে বাঁধা রে,
এ কি সত্য ?
ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,
এ কি সত্য ?
ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি,
আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া ?
এ কি সত্য ?
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে,
এ কি সত্য ?
মোর সুকুমার ললাটফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য ?

১৩ আশ্বিন ১৩০৪
রেলপথে

আশা

এ জীবনসূর্য যবে অস্তে গেল চলি,
হে বঙ্গজননী মোর, 'আয় বৎস' বলি
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশদুয়ার,
ললাটে চুম্বন দিলে, শিয়রে আমার
জ্বালিলে অনন্ত দীপ। ছিল কণ্ঠে মোর
একখানি কণ্টকিত কুসুমের ডোর
সংগীতের পুরস্কার, তারি ক্ষতজ্বালা
হৃদয়ে জ্বলিতেছিল— তুলি সেই মালা
প্রত্যেক কণ্টক তার নিজ হস্তে বাছি
ধূলি তার ধুয়ে ফেলি শুভ্র মালাগাছি
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া
মোরে তব চিরন্তন সম্মান করিয়া।
অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন—
সহসা জাগিয়া দেখি, এ শুধু স্বপন।

. ১০৫

বঙ্গলক্ষ্মী

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,
তব আম্রবনে-ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে দ্বাদশ-দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।

এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোনো কাজে,
নাহি জান সে বারতা। তুমি শুধু মা গো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগ
মলয়বীজন করি। রয়েছ মা, ভুলি—
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।

নিত্যকর্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যূষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ ; যবে আসে বিভাবরী
চারি দিক হতে তব যত নদনদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে।

শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতঃ, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা, স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ।
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবি-চক্ষে ভরি আসে জল।

শরৎ

আজি কী তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কাননসভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী,
শরৎকালের প্রভাতে।

জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী, তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীলবরনি,
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হতে তরণী।
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধশীতল ধরণী।

বহিছে প্রথম শিশিরসমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে—
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে মাতা, কত আয়োজন—
হাসিভরা-মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে।

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া—

ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।
ও পার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ও পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে—
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়,
আয় তোরা সবে জুটিয়া।
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনককিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুমভূষণ জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

মাতার আহ্বান

বারেক তোমার দুয়ারে দাঁড়ায়ে
ফুকারিয়া ডাকো জননী।
প্রান্তরে তব সন্ধ্যা নামিছে,
আঁধারে ঘেরিছে ধরণী।
ডাকো, 'চলে আয়, তোরা কোলে আয়।'
ডাকো সকরুণ আপন ভাষায়,
সে বাণী হৃদয়ে করুণা জাগায়,
বেজে উঠে শিরা ধমনী—
হেলায় খেলায় যে আছে যেথায়
সচকিয়া উঠে অমনি।

আমরা প্রভাতে নদী পার হয়ে
ফিরিনু কিসের দুরাশে।
পরের উঞ্ছ অঞ্চলে লয়ে
চলিনু জঠরহুতাশে।
খেয়া বহে নাকো, চাহি ফিরিবারে,
তোমার তরণী পাঠাও এ পারে,
আপনার খেত গ্রামের কিনারে
পড়িয়া রহিল কোথা সে।
বিজন বিরাট শূন্য সে মাঠ
কাঁদিছে উতলা বাতাসে।

কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপখানি তব
নিবু-নিবু করে পবনে—
জননী, তাহারে করিয়ো রক্ষা
আপন বক্ষোবসনে।
তুলি ধরো তারে দক্ষিণ করে—
তোমার ললাটে যেন আলো পড়ে,
চিনি দূর হতে, ফিরে আসি ঘরে
না ভুলি আলেয়া-ছলনে।
এ পারে দুয়ার রুদ্ধ জননী,
এ পরপুরীর ভবনে।

তোমার বনের ফুলের গন্ধ
আসিছে সন্ধ্যাসমীরে।
শেষ গান গাহে তোমার কোকিল
সুদূরকুঞ্জতিমিরে।
পথে কোনো লোক নাহি আর বাকি,
গহন কাননে জ্বলিছে জোনাকি,
আকুল অশ্রু ভরি দুই আঁখি
উচ্ছ্বসি উঠে অধীরে।
'তোরা যে আমার' ডাকো একবার
দাঁড়ায়ে দুয়ারবাহিরে।

৭ আষাঢ় ১৩০২
নাগর নদী। আত্রাই-পথে

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

যে তোমারে দূরে রাখি নিত্য ঘৃণা করে,
হে মোর স্বদেশ,
মোরা তারি কাছে ফিরি সম্মানের তরে
পরি তারি বেশ।
বিদেশী জানে না তোরে, অনাদরে তাই
করে অপমান—
মোরা তারি পিছে থাকি যোগ দিতে চাই
আপন সন্তান।
তোমার যা দৈন্য মাতঃ, তাই ভূষা মোর
কেন তাহা ভুলি।
পরধনে ধিক্ গর্ব— করি করজোড়,
ভরি ভিক্ষাঝুলি।
পুণ্যহস্তে শাক-অন্ন তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে।
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে
তাহে লজ্জা ঘুচে।
সেই সিংহাসন যদি অঞ্চলটি পাত,
কর স্নেহ দান।
যে তোমারে তুচ্ছ করে সে আমারে মাতঃ,
কী দিবে সম্মান।

১৩০৯

হতভাগ্যের গান

বিভাস। একতালা

বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা
সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জান ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা,
নাইকো তাহে প্রতারণা—

টান যখন মরণ-ফাঁসি বল নাকো মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

ধরার যারা সেরা সেরা মানুষ তারা তোমার ঘরে।
তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে।
আমরা বরপুত্র তব
যাহাই দিবে তাহাই লব,
তোমায় দিব ধন্যধ্বনি মাথায় বহি সর্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা, লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধ ভালে প্রলয়শিখা
দিক মা, এঁকে তোমার টিকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা— জীর্ণ কন্থা, ছিন্ন বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে কপট সখার শূন্য হাসি।
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা-কাশী।
আত্মপরের-প্রভেদ-ভোলা
জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা—
থাকবে তুমি থাকব আমি সমানভাবে বারো মাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

শঙ্কা-তরাস লজ্জা-শরম চুকিয়ে দিলেম স্তুতি-নিন্দে।
ধুলো সে তোর পায়ের ধুলো তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, 'ঠাকুরানী,
তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি তারেও ফাঁকি দিতে চাস!'
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

মৃত্যু যেদিন বলবে 'জাগো, প্রভাত হল তোমার রাতি'
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি
চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ—
বিদায়কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস।

৭ আশ্বিন ১৩০৪। [illegible] নদী
পরিবর্ধন: ৭ আষাঢ় ১৩০৫
নাগর নদী। পতিসর

জুতা-আবিষ্কার

কহিলা হবু, 'শুন গো গোবুরায়,
　　কালিকে আমি ভেবেছি সারা রাত্র—
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
　　ধরণী-মাঝে চরণ ফেলা মাত্র!
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি,
　　রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি।
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
　　রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি!
　　　শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার,
　　　নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।'

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
　　দারুণ ত্রাসে ঘর্ম বহে গাত্রে।
পণ্ডিতের হইল মুখ চুন,
　　পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে।
রান্নাঘরে নাহিক চড়ে হাঁড়ি,
　　কান্নাকাটি পড়িল বাড়ি-মধ্যে।
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
　　কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,—

'যদি না ধুলা লাগবে তব পায়ে
পায়ের ধুলা পাইব কী উপায়ে!'

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
কহিল শেষে, 'কথাটা বটে সত্য।
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব।
ধুলা-অভাবে না পেলে পদধুলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন-বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে!
আগের কাজ আগে তো তুমি সারো,
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো।'

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী
যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী—
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী।
বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ-পিপে নস্য—
অনেক ভেবে কহিল, 'গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য!'
কহিল রাজা, 'তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রহেছ কেন তবে?'

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধুলা এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ।
ধুলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
ধুলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য।
ধুলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধুলার মাঝে নগর হল উহ্য।
কহিল রাজা, 'করিতে ধুলা দূর,
জগৎ হল ধুলায় ভরপুর।'

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক কাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি—
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।
কহিল রাজা, 'এমনি সব গাধা
ধুলারে মারি করিয়া দিল কাদা।'

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে,
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত—

ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধুলার হায় নাহিক পায় অন্ত।
কহিল, 'মহী মাদুর দিয়ে ঢাকো,
ফরাশ পাতি করিব ধুলা বন্ধ।'
কহিল কেহ, 'রাজারে ঘরে রাখো,
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।
ধুলার মাঝে না যদি দেন পা
তা হলে পায়ে ধুলা তো লাগে না।'

কহিল রাজা, 'সে কথা বড়ো খাটি,
কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ,
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
দিবস-রাত্রি রহিলে আমি বন্ধ।'
কহিল সবে, 'চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
মহীপতির রহিবে মহাকীর্তি।'
কহিল সবে, 'হবে সে অবহেলে,
যোগ্যমতো চামার যদি মেলে।'

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা,
ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম।
যোগ্যমতো চামার নাহি কোথা,
না মিলে তত উচিতমতো চর্ম।

তখন ধীরে চামার-কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
'বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।'

কহিল রাজা, 'এত কি হবে সিধে!
ভাবিয়া মোলো সকল দেশশুদ্ধ।'
মন্ত্রী কহে, 'বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ।'
রাজার পদ চর্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে—
মন্ত্রী কহে, 'আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে।'
সেদিন হতে চলিল জুতো পরা—
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

১৩০৪

সে আমার জননী রে

ভৈরবী। রূপক

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়নের নীরে ?
কে বৃথা আশাভরে
চাহিছে মুখ-'পরে ?
সে যে আমার জননী রে।

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি ?
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায় ?
সে যে আমার জননী রে।

ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে।

পুণ্য কুটিরে বিষণ্ণ
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন ?
সে স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর !
সে যে আমার জননী রে।

[১৩০৪]

জগদীশচন্দ্র বসু

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।

বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত
পণ্ডিতসভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে।
সে ধ্বনি গম্ভীরমন্দ্রে ছায় চারি ধার
হয়ে সিন্ধু পার।

আজি মাতা পাঠাইছে অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ।
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

১৩০৪

ভিখারি

ভৈরবী। একতালা

ওগো   কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই ?
ওগো   ভিখারি, আমার ভিখারি, চলেছ
কী কাতর গান গাই' !
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
ভুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে,
ভিখারি, আমার ভিখারি।
হায়   পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
আর তো কিছুই নাই।
ওগো   কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই !

আমি   আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস।
আমি   আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পুরাতে আশ।
মম প্রাণমন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
ভিখারি, আমার ভিখারি।

হায়   আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই।
ওগো   কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই!

১২ [আশ্বিন ১৩০৭]
পতিসর

যাচনা

কীর্তন

ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো— তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো— তোমার
চরণমঞ্জীরে।

ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখিটি— তোমার
প্রাসাদপ্রাঙ্গণে।
মনে ক'রে সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখিটি— তোমার
কনককঙ্কণে।

আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো— তোমার
অলকবন্ধনে।
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দুরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো— তোমার
ললাটচন্দনে।

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো গো— তোমার
অঙ্গসৌরভে।
আমার আকুল জীবনমরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো গো— তোমার
অতুল গৌরবে।

৮ আশ্বিন ১৩০৪
সাহাজাদপুর। বোট

বিদায়

বিভাস

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কলকোলাহল,
তরণীপতাকা চলচঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর,
নির্মম আমি আজি।
আর নাই দেরি, ভৈরবভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি—
অমিয়রচন সোহাগবচন
অনেক রয়েছে বাকি।
পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারে-বার
আমারে ডাকিছে সবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর।
কিসেরি বা সুখ, ক' দিনের প্রাণ!
ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

৭ আশ্বিন ১৩০২
ইছামতী

লীলা

সিন্ধু-ভৈরবী

কেন	বাজাও কাঁকন কনকন, কত
ছলভরে !
ওগো	ঘরে ফিরে চলো কনককলসে
জল ভ'রে ।
কেন	জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি
কর খেলা !
কেন	চাহ খনে খনে চকিত নয়নে
কার তরে
কত	ছলভরে !

হেরো	যমুনাবেলায় আলসে হেলায়
গেল বেলা,
যত	হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি
কলস্বরে
কত	ছলভরে !
হেরো	নদীপরপারে গগনকিনারে
মেঘ-মেলা,
তারা	হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখ-'পরে
কত	ছলভরে !

[ভাদ্র-আশ্বিন] ১৩০৪

নববিরহ

মল্লার

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল-আঁখি পড়িল মনে—
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি-বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়খনে—
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

ঝরোঝরো ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরানপুটে
কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয়কোণে—
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে।

৮ আশ্বিন ১৩০৪
ইছামতী

লজ্জিতা

ভৈরবী

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—
বেলা হল, মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে!
আলোকপরশে মরমে মরিয়া
হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে।
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—
বেলা হল, মরি লাজে।

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি।
রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি।
পাখি ডাকি বলে— গেল বিভাবরী,
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি,
আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে!
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—
বেলা হল, মরি লাজে।

৭ আশ্বিন ১৩০৪
যমুনা

কাল্পনিক

বেহাগ

আমি   কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে—
তাই   আকাশকুসুম করিনু চয়ন
হতাশে।
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে।

কিছু   বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা
বাঁধনে।
কেহ   নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর
সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা
অনলশিখায় কী করিনু খেলা,
দিনশেষে দেখি ছাই হল সব
হুতাশে।
আমি   কেবলি স্বপন করেছি বপন
বাতাসে।

৮ আশ্বিন ১৩০৪
বলেশ্বরী

মানসপ্রতিমা

ইমনকল্যাণ

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্তসুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য-গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিহারী।

মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন বিহারী।

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধ-নয়ন-বিহারী।

মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী।

৯ আশ্বিন ১৩০৭
চলন বিল। ঝড়বৃষ্টি

সংকোচ

ছায়ানট

যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।
যদি শরম লাগে, মুখে
চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

যদি থমকি থেমে যাও
পথ-মাঝে,
আমি চমকি চলে যাব
আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

৯ আশ্বিন ১৩০৪

চলন বিল। ঝড়। বোট টলমল

প্রার্থী

কালাড়া

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
তব নবপ্রভাতের নবীনশিশির ঢালা।
শরমে জড়িত কত-না গোলাপ
কত-না গরবী করবী
কত-না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

অমল শরত-শীতল-সমীর
বহিছে তোমার কেশে,
কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার
অধরে পড়েছে এসে।
অঞ্চল হতে বনপথে ফুল
যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া,
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

১০ আশ্বিন ১৩০৪
নাগর নদী

সকরুণা

আলেয়া

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুলকাননে,
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে।
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !

সখী, তরুর তলায় বসে সে ধুলায় যে।
সেথা বকুলমালায় আসন বিছায়ে দে।
সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে—
কেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে !
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে !

১০ আশ্বিন ১৩০৪

নাগর নদী। মেঘবৃষ্টি। অমাবস্যা

বিবাহমঙ্গল

ঝিঁঝিট

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন

পাতিয়া বোসো হে হৃদয়নাথ।

কল্যাণকরে মঙ্গলডোরে

বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত।

প্রাণেশ, তোমারি প্রেম অনন্ত

জাগাক জীবনে নববসন্ত,

যুগল প্রাণের নবীন মিলনে

করো হে করুণনয়নপাত।

সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ,

বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,

আজিকে তোমারি প্রসাদ অরুণ

করুক উদয় নবপ্রভাত।

তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব

তোমারি মাধুরী তোমারি সত্য

দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য

নব নব রূপে দিবস রাত।

১৩০৪

ভারতলক্ষ্মী

ভৈরবী

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী !
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনকজননী-জননী !
নীলসিন্ধুজলধৌত চরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী !

প্রথম প্রভাত-উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী !

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী ।

পৌষ ১৩০৩

প্রকাশ

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহে নি কথা।
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা,
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে,
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি—
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে।

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি,
লতাপাতা চাঁদ মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি।
ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপনমাখা,
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য মনোরথে
ভাবনা-সাধনা বেদনা-বিহীন বিফল ভ্রমণপথে—
মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া
একা বসি কোণে জানিত রচিতে ঘনগম্ভীর মায়া।

দ্যুলোকে ভূলোকে ভাবে নাই কেহ আছে সে কিসের খোঁজে—
হেন সংশয় ছিল না কাহারো সে যে কোনো কথা বোঝে।

বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিল নাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে ;
বাসরঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুধিয়া দিত না তবু—
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি।

শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালোবাসা
এরে দেখি হেসে ভাবিত, এ লোক জানে না চোখের ভাষা।
নলিনী যখন খুলিত পরান চাহি তপনের পানে
ভাবিত, এ জন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে।
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে
ভাবিত, এ খ্যাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে !
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা,
আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্মরকথা।

একদা ফাগুনে সন্ধ্যাসময়ে সূর্য নিতেছে ছুটি,
পূর্বগগনে পূর্ণিমাচাঁদ করিতেছে উঠি-উঠি ,
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে
ছল ক'রে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছু-পানে ;
কোনো সাহসিকা দুলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি—
না চাহে নামিতে, না চাহে থামিতে, না মানে বিনয়বাণী ;
কোনো মায়াবিনী মৃগশিশুটিরে তৃণ দেয় একমনে,
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে—

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল, ‘নরনারী, শুন সবে,
কত কাল ধরে কী যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে।
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত, আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারা রাত নিদ নাহি।
উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
এতকাল ধরে তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন্ ছলে।
এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে
বড়ো বড়ো যত পণ্ডিত জনা বুঝিল না তার মানে।’

শুনিয়া তপন অস্তে নামিল শরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি।
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা—
দখিন-বাতাস বলে গেল তারে, সকলি পড়েছে ধরা।
শুনে ছি-ছি ব’লে শাখা নাড়ি নাড়ি শিহরি উঠিল লতা,
ভাবিল, মুখর এখনি না জানি আরো কী রটাবে কথা।
ভ্রমর কহিল যূথীর সভায়, যে ছিল বোবার মতো
পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত।

শুনিয়া তখনি করতালি দিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি।
‘হয়েছে প্রমাণ, হয়েছে প্রমাণ’ হাসিয়া সবাই কহে,
‘যে কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহারো নহে।’
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি,
‘আকাশে পাতালে মরতে আজি তো গোপন কিছুই নাহি।’

কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
'ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল তুমি আমি কোথা আছি।'

হায় কবি হায়, সে হতে প্রকৃতি হয়ে গেছে সাবধানী—
মাথাটি ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়েছে টানি।
যত ছলে আজ যত ঘুরে মরি জগতের পিছু-পিছু
কোনোদিন কোনো গোপন খবর নূতন মেলে না কিছু।
শুধু গুঞ্জনে কূজনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে,
লুকানো কথার হাওয়া বহে যেন বন হতে উপবনে,
মনে হয়, যেন আলোতে ছায়াতে রয়েছে কী ভাব ভরা—
হায় কবি হায়, হাতে হাতে আর কিছুই পড়ে না ধরা।

১৩০৪

উন্নতিলক্ষণ

১

ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী

জগৎব্যাপারে অজ্ঞ,

শুধাই তোমায়, এ পুরশালায়

আজি এ কিসের যজ্ঞ।

সিংহদুয়ারে পথের দু ধারে

রথের না দেখি অন্ত—

কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে

যত উষ্ণীষবন্ত ?

বসেছেন ধীর অতিগম্ভীর

দেশের প্রবীণ বিজ্ঞ,

প্রবেশিয়া ঘরে সংকোচে ডরে

মরি আমি অনভিজ্ঞ।

কোন্ শূরবীর জন্মভূমির

ঘুচালো হীনতাপঙ্ক ?

ভারতের শুচি যশশশীরুচি

কে করিল অকলঙ্ক ?

রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ

কাহারে করিতে ধন্য ?

বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা

কাহার পূজার জন্য ?

উত্তর

গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব
করিয়া উদরপূর্তি,
এঁরা বড়োলোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি॥

অভাগা কে ওই মাগে নামসই,
দ্বারে দ্বারে ফিরে খিন্ন—
তবু উৎসাহে রচিবারে চাহে
কাহার স্মরণচিহ্ন?
সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসে হায়—
নয়ন অশ্রুসিক্ত,
হৃদয় ক্ষুণ্ণ, খাতাটি শূন্য,
থলি একেবারে রিক্ত।
যাহার লাগিয়া ফিরিছে মাগিয়া
মুছি ললাটের ঘর্ম,
স্বদেশের কাছে কী সে করিয়াছে?
কী অপরাধের কর্ম?

উত্তর

আর কিছু নহে, পিতাপিতামহে
বসায়ে গেছে সে উচ্চে,
জন্মভূমিরে সাজায়েছে ঘিরে
অমর পুষ্পগুচ্ছে॥

২

দেবী দশভুজা, হবে তাঁরি পূজা,
মিলিবে স্বজনবর্গ—
হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
নূতন পূজার অর্ঘ্য ?
কার সেবা-তরে আসিতেছে ঘরে
আয়ুহীন মেষবৎস ?
নিবেদিতে কারে আনে ভারে ভারে
বিপুল ভেটকি মৎস্য ?
কী আছে পাত্রে যাহার গাত্রে
বসেছে তৃষিত মক্ষী ?
শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ
মন্ত্রনিষিদ্ধ পক্ষী।
দেবতার সেরা কী দেবতা এঁরা,
পূজাভবনের পূজ্য—
যাহাদের পিছে পড়ে গেছে নীচে,
দেবী হয়ে গেছে উহ্য ?

উত্তর

ম্যাকে, ম্যাকিনন, অ্যালেন, ডিলন
দোকান ছাড়িয়া সদ্য
সরবে গরবে পূজার পরবে
তুলেছেন পাদপদ্ম।

এসেছিল দ্বারে পূজা দেখিবারে
দেবীর বিনীত ভক্ত—
কেন যায় ফিরে অবনতশিরে,
অবমানে আঁখি রক্ত ?
উৎসবশালা, জ্বলে দীপমালা,
রবি চলে গেছে অস্তে—
কুতূহলীদলে কী বিধানবলে
বাধা পায় দ্বারীহস্তে ?
ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,
সমাজ হইতে ভিন্ন ?
পূজাদ্রানধ্যানে ছেলেখেলা জ্ঞানে
এরা মনে মানে ঘৃণ্য ?

উত্তর

না না, এরা সবে ফিরিছে নীরবে
দীন প্রতিবেশীবৃন্দে—
সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,
এরা এলে হবে নিন্দে ॥

অনুরাগভরে ঘুচাবার তরে
বঙ্গভূমির দুঃখ
এ সভা মহতী ; এর সভাপতি
সভ্যেরা দেশমুখ্য ।
এরা দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে
আপন রক্তমাংস,
তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে
এ দেশের অধিকাংশ ?
কেন দলে দলে দূরে যায় চ'লে,
বুঝে না নিজের ইষ্ট—
যদি কুতূহলে আসে সভাতলে
কেন বা নিদ্রাবিষ্ট ?
তবে কি ইহারা নিজ-দেশ-ছাড়া—
রুধিয়া রয়েছে কর্ণ
দৈবের বশে পাছে কানে পশে
শুভকথা এক বর্ণ ?

উত্তর

না না, এঁরা হন জনসাধারণ,
জানে দেশভাষামাত্র,
স্বদেশসভায় বসিবারে হায়
তাই অযোগ্য পাত্র ॥

৪

বেশভূষা ঠিক যেন আধুনিক,
মুখ দাড়ি-সমাকীর্ণ,
কিন্তু বচন অতি পুরাতন,
ঘোরতর জরাজীর্ণ—
উচ্চ আসনে বসি একমনে
শূন্যে মেলিয়া দৃষ্টি
তরুণ এ লোক লয়ে মনুশ্লোক
করিছে বচনবৃষ্টি।
জলের সমান করিছে প্রমাণ—
কিছু নহে উৎকৃষ্ট
শালিবাহনের পূর্ব সনের
পূর্বে যা নহে সৃষ্ট।
শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে
নিখিল পুরাণতত্ত্বে?
বয়স নবীন করিছেন ক্ষীণ
প্রাচীন বেদের মন্ত্রে?
আছেন কি তিনি লইয়া পাণিনি
পুঁথি লয়ে কীটদষ্ট?
বায়ুপুরাণের পুঁজি পাঠ-ফের
আয়ু করিছেন নষ্ট?
প্রাচীনের প্রতি গভীর আরতি,
বচনরচনে সিদ্ধ—

কহ তো মশায়, প্রাচীন ভাষায়
কতদূর কৃতবিদ্য ?

উত্তর

ঋজুপাঠ দুটি নিয়েছেন লুটি,
দু সর্গ রঘুবংশ,
মোক্ষমুলার হতে অধিকার
শাস্ত্রের বাকি অংশ।

পণ্ডিত ধীর, মুণ্ডিত শির,
প্রাচীনশাস্ত্রে শিক্ষা—
নবীন-সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজম্‌-শক্তি,
তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণ বলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা

অশেষ

আবার আহ্বান ?
যত কিছু ছিল কাজ সাঙ্গ তো করেছি আজ
দীর্ঘ দিনমান।
জাগায়ে মাধবীবন চলে গেছে বহুক্ষণ
প্রত্যুষ নবীন,
প্রখর পিপাসা হানি পুষ্পের শিশির টানি
গেছে মধ্যদিন।
মাঠের পশ্চিমশেষে অপরাহ্ণ ম্লান হেসে
হল অবসান,
পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি তরণীতে,
আবার আহ্বান ?

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার-আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা—
দিনের কল্লোল 'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।
ও পারের কালো কূলে কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমিরতলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।

নয়নপল্লব-'পরে স্বপ্ন জড়াইয়া ধরে,
থেমে যায় গান,
ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতিসম,
এখনো আহ্বান ?

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী ?
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান ?

দক্ষিণসমুদ্রপারে, তোমার প্রাসাদদ্বারে
হে জাগ্রত রানী,
বাজে না কি সন্ধ্যাকালে শান্ত সুরে ক্লান্ত তালে
বৈরাগ্যের বাণী ?
সেথায় কি মূক বনে ঘুমায় না পাখিগণে
আঁধার শাখায় ?

তারাগুলি হর্ম্যশিরে উঠে না কি ধীরে ধীরে
নিঃশব্দ পাখায় ?
লতাবিতানের তলে বিছায় না পুষ্পদলে
নিভৃত শয়ান ?
হে অশ্রান্ত শান্তিহীন, শেষ হয়ে গেল দিন,
এখনো আহ্বান ?

রহিল রহিল তবে— আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,
মোর সন্ধ্যাদীপালোক, পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।
খেয়াতরী যাক বয়ে গৃহ-ফেরা লোক লয়ে
ও পারের গ্রামে,
তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী ধীরে পড়ে যাক খসি
কুটিরের বামে।
রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ—
আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান।

বলো তবে কী বাজাব, ফুল দিয়ে কী সাজাব
তব দ্বারে আজ—

রক্ত দিয়ে কী লিখিব, প্রাণ দিয়ে কী শিখিব,
কী করিব কাজ ?
যদি আঁখি পড়ে ঢুলে, শ্লথ হস্ত যদি ভুলে
পূর্ব নিপুণতা,
বক্ষে নাহি পাই বল, চক্ষে যদি আসে জল,
বেধে যায় কথা—
চেয়ো নাকো ঘৃণাভরে, কোরো নাকো অনাদরে
মোরে অপমান—
মনে রেখো হে নিদয়ে, মেনেছিনু অসময়ে
তোমার আহ্বান।

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্রশত
তোমার দুয়ারে—
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দু ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাই নে দেবী,
ডাক' ক্ষণে ক্ষণে—
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্বে জাগি রব সারা রাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র-নয়ান,
সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান।

হবে, হবে, হবে জয়, হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বানবাণী সফল করিব রানী,
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা—
নবীন প্রভাত-লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি,
দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নব প্রাতে নব সেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

বিদায়

ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো,
হউক সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়,
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি,
শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর—
খেলা হতে খেলাশ্রান্তি,
বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।

দিনান্তের নম্র কর
পড়ুক মাথার 'পর,
আঁখি-'পরে ঘুম—
হৃদয়ের পত্রপুটে
গোপনে উঠুক ফুটে
নিশার কুসুম।

আরতির শঙ্খরবে
নামিয়া আসুক তবে
পূর্ণ পরিণাম—
হাসি নয়, অশ্রু নয়,
উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্রাম।

প্রভাতে যে পাখি সবে
গেয়েছিল কলরবে
থামুক এখন।
প্রভাতে যে ফুলগুলি
জেগেছিল মুখ তুলি
মুদুক নয়ন।
প্রভাতে যে বায়ুদল
ফিরেছিল সচঞ্চল
যাক থেমে যাক।
নীরবে উদয় হোক
অসীম নক্ষত্রলোক
পরমনির্বাক্।

হে মহাসুন্দর শেষ,
হে বিদায় অনিমেষ,
হে সৌম্য বিষাদ—

ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির,
মুছায়ে নয়ননীর
করো আশীর্বাদ।
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির,
পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে—
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি
নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে।

১০ চৈত্র ১৩০৫

বর্ষশেষ

১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি দীর্ঘধারা।
বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান—
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

ধূসরপাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্ধ্বমুখে,
ছুটে চলে চাষি,
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি—
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝংকারঝঞ্ঝনা,
তোলো উচ্চ সুর,
হৃদয় নির্দয় ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।
ধাও গান, প্রাণ-ভরা ঝড়ের মতন ঊর্ধ্ববেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া,
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

মুক্ত করি দিনু দ্বার; আকাশের যত বৃষ্টিঝড়,
আয় মোর বুকে—
শঙ্খের মতন তুলি', একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।

বিজয়গর্জনস্বনে অভ্র ভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ।

সে পূর্ণ উদাত্ত ধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্র -সম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হতে মুহূর্তে অখণ্ড মূর্তি ধরি
হউক বাহির।
নাহি তাহে দুঃখ সুখ, পুরাতন তাপ পরিতাপ,
কম্প লজ্জা ভয়—
শুধু তাহা সদ্যস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে—
ব্যাপ্ত করি', লুপ্ত করি', স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘনঘোরস্তূপে।
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক্ দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহো ক্ষণকাল।

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সংগীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জে আসে,
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি হানে—
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।

এবার আস নি তুমি বসন্তের আবেশহিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি,
এবার আস নি তুমি মর্মরিত কূজনে গুঞ্জনে—
ধন্য ধন্য তুমি।
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজসম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম নাহি বুঝিলাম—
জয় তব জয়।

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল

পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ—
প্রণমি তোমারে।

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,
অক্লান্ত অম্লান'!
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন
কিছু নাহি জান।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জলদর্চিরেখা—
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা।

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন-রনন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।
হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান—
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরান।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভক্ষতি-টানাটানি, অতিসূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়-
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

তার পরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো, যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন করো পাখা—
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃত পত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ—
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ততমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ।

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন,
মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথগগনে।

৩০ চৈত্র ১৩০৫

ঝড়ের দিনে

আজি এই আকুল আশ্বিনে,
মেঘে-ঢাকা দুরন্ত দুর্দিনে,
হেমন্ত-ধানের খেতে   বাতাস উঠেছে মেতে,
কেমনে চলিবে পথ চিনে—
আজি এই দুরন্ত দুর্দিনে ?

দেখিছ না ওগো সাহসিকা,
ঝিকিমিকি বিদ্যুতের শিখা।
মনে ভেবে দেখো তবে—   এ ঝড়ে কি বাঁধা রবে
কবরীর শেফালিমালিকা ?
ভেবে দেখো ওগো সাহসিকা।

আজিকার এমন ঝঞ্ঝায়
নূপুর বাঁধে কি কেহ পায় ?
যদি আজি বৃষ্টিজল   ধুয়ে দেয় নীলাঞ্চল
গ্রামপথে যাবে কী লজ্জায়—
আজিকার এমন ঝঞ্ঝায় ?

হে উতলা, শোনো কথা শোনো—
দুয়ার কি খোলা আছে কোনো ?
এ বাঁকা পথের শেষে   মাঠ যেথা মেঘে মেশে
বসে কেহ আছে কি এখনো
এ দুর্যোগে— শোনো ওগো শোনো।

আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে ?
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি
আশ্বিনের অসীম আঁধারে—
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে ?

মেঘ যদি ডাকে গুরুগুরু,
নৃত্য-মাঝে কেঁপে ওঠে ঊরু,
কাহারে করিবে রোষ, কার 'পরে দিবে দোষ—
বক্ষ যদি করে দুরুদুরু—
মেঘ ডেকে ওঠে গুরুগুরু ?

যাবে যদি, মনে ছিল না কি—
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?
আমি তো পথেরি ধারে বসিয়া ঘরের দ্বারে
আনমনে ছিলাম একাকী।
আমারে নিলে না কেন ডাকি ?

কখন প্রহর গেছে বাজি,
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি।
ঘরে আসে নাই কেহ, সারা দিন শূন্য গেহ,
বিলাপ করেছে তরুরাজি।
কোনো কাজ নাহি ছিল আজি।

যত বেগে গরজিত ঝড়,
যত মেঘে ছাইত অম্বর,
রাত্রে অন্ধকারে যত পথ অফুরান হত
আমি নাহি করিতাম ডর—
যত বেগে গরজিত ঝড়।

বিদ্যুতের চমকানি-কালে
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে।
উত্তরী উড়িত মম উড়ন্ত পাখার সম,
মিশে যেত আকাশে পাতালে—
বিদ্যুতের চমকানি কালে।

তোমায় আমায় একত্তর
সে যাত্রা হইত ভয়ংকর।
তোমার নূপুর আজি প্রলয়ে উঠিত বাজি,
বিজুলি হানিত আঁখি'পর—
যাত্রা হত মত্ত ভয়ংকর।

কেন আজি যাও একাকিনী?
কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিণী?
এ দুর্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী?
কোথা আজি যাও একাকিনী?

১৩০০

অসময়

হয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে?

এখনো সময় আছে কি, সময় আছে কি?

দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে—

ফুরালো কি পথ? এসেছি পুরীর কাছে কি?

মনে হয়, সেই সুদূর মধুর গন্ধ রে

রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে।

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—

এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে?

ও যে দুটি তারা দূর পশ্চিমগগনে।

ও কি শিঞ্জিত ধ্বনিছে কনকমঞ্জীরে?

ঝিল্লির রব বাজে বনপথে সঘনে।

মরীচিকালেখা দিগন্তপথ রঞ্জি রে

সারা দিন আজি ছলনা করেছে হতাশে।

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—

এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

এত দিনে সেথা বনবনান্ত নন্দিয়া

নববসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি।

তরুণ আশার সোনার প্রতিমা বন্দিয়া

নব আনন্দে ফিরিছে যুবক যুবতী।

বীণার তন্ত্রী আকুল ছন্দে ক্রন্দিয়া

ডাকিছে সবারে আছে যারা দূর প্রবাসে।

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—

এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে,

মুক্ত আকাশে যাপিবে জ্যোৎস্নাযামিনী।

দলে দলে চলে, বাঁধাবাঁধি বাহুবন্ধনে—

ধ্বনিছে শূন্যে জয়সংগীতরাগিণী।

নূতন পতাকা নূতন প্রাসাদপ্রাঙ্গণে

দক্ষিণবায়ে উড়িছে বিজয়বিলাসে।

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—

এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

সারা নিশি ধরে বৃথা করিলাম মন্ত্রণা,

শরৎ-প্রভাত কাটিল শূন্যে চাহিয়া।

বিদায়ের কালে দিতে গেনু কারে সান্ত্বনা,

যাত্রীরা কোথা গেল খেয়াতরী বাহিয়া।

আপনারে শুধু বৃথা করিলাম বঞ্চনা,

জীবন-আহুতি দিলাম কী আশা-হুতাশে!

বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—

এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

প্রভাতে আমায় ডেকেছিল সবে ইঙ্গিতে,
বহুজন-মাঝে লয়েছিল মোরে বাছিয়া—
যবে রাজপথ ধ্বনিয়া উঠিল সংগীতে
তখনো বারেক উঠেছিল প্রাণ নাচিয়া।
এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে—
দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিল আকাশে।

তবু একদিন এই আশাহীন পন্থ রে
অতি দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে শেষে ফুরাবে।
দীর্ঘ ভ্রমণ এক দিন হবে অন্ত রে,
শান্তিসমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।
দুয়ারপ্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির-প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।
বহু সংশয়ে বহু বিলম্ব করেছি—
এখন বন্ধ্যা সন্ধ্যা আসিছে আকাশে।

১৩০৬

বসন্ত

অযুত বৎসর আগে হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে,
মত্ত কুতূহলী,
প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণদুয়ার
মর্ত্যে এলে চলি,
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটিরপ্রাঙ্গণে
পীতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মন্দারমঞ্জরী,
দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি
লয়ে বীণাবেণু—
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।

সখা, সেই অতিদূর সদ্যোজাত আদিমধুমাসে
তরুণ ধরায়
এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের
স্বর্ণমদিরায়
সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্তপ্রবীণ
নব পুষ্পরাজি

বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই লয়ে আজো পুনর্বার
সাজাইলে সাজি।
তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা।

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি
লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু গান হাসি।
যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সযত্ন-সেচন-সিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।

আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে কয়টি কথা
তোমার কুসুমগুলি, হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা!

সে চম্পক, সে বকুল, সে চঞ্চল চকিত চামেলি
স্মিত শুভ্রমুখী,
তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক-উন্নমিতা
একান্তকৌতুকী—
কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবনকাব্যগাথা
লয়েছিল পড়ি,
কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল দুটি বক্ষোমাঝে
বাসনা-বাঁশরি।

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়
ওগো মধুমাস,
তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে
হইবে প্রকাশ।
বকুলে চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহুকলস্বরে।
অমর বেদনা মোর হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মরনিশ্বাসে,
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।

ভগ্ন মন্দির

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না
বীণার তন্ত্রী বিরতা।
সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ
তোমার আরতি-বারতা।
তব মন্দির স্থিরগম্ভীর,
ভাঙা দেউলের দেবতা!

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নববসন্তপবনে।
যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য,
রাখে নি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার
জনহীন ভাঙা ভবনে।

পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারা দিন ফিরে উদাসীন
কার প্রসাদের ভিখারি!

গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায়
চির-উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে
পূজাহীন তব পূজারি।

ভাঙা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব,
কত পূজানিশা বিগতা!
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা
কত যায় কত কব তা—
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন
ভাঙা দেউলের দেবতা

বৈশাখ

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!
কী ভীম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন-আকাশে
নিঃশব্দ প্রখর—
ছায়ামূর্তি তব অনুচর!

মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ,
রহি রহি দহি দহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
চূর্ণ রেণুরাশ—
মত্তশ্রমে শ্বসিছে হুতাশ।

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে ব'স আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদী-তীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী—
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী।

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার—
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।

হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ—
হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।

সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব 'পরে
ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে, ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
অশ্বত্থছায়াতে—
সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে।

দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ
তোমার ফুৎকার ক্ষুব্ধ ধুলা-সম উড়ুক গগনে,
ভ'রে দিক নিকুঞ্জের স্খলিত ফুলের গন্ধ-সনে
আকুল আকাশ—
দুঃখ সুখ আশা ও নৈরাশ।

তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল—
দাও পাতি গেরুয়া অঞ্চল।

ছাড়ো ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ!
ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে,
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক্—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!

১৩০৬

রাত্রি

মোরে করো সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমার আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।
তোমার তিমিরতলে যে বিপুল নিঃশব্দ উদ্যোগ
ভ্রমিতেছে জগতে জগতে
আমারে তুলিয়া লও সেই তার ধ্বজচক্রহীন
নীরবঘর্ঘর মহারথে।

তুমি একেশ্বরী রানী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে
সুগম্ভীরা হে শ্যামাসুন্দরী!
দিবসের ক্ষয়ক্ষীণ বিরাট ভাণ্ডারে প্রবেশিয়া
নীরবে রাখিছ ভাণ্ড ভরি।
নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তিসিংহাসনে
তোমার মহান্ জাগরণ।
আমারে জাগায়ে রাখো সে নিস্তব্ধ জাগর-তপে
নির্নিমেষ পূর্ণসচেতন।

কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর।

তোমার নির্বাক্ মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিল বসি
কত ভক্ত জুড়ি দুই কর।
দিবস মুদিলে চক্ষু, ধীরপদে কৌতূহলী-দল
অঙ্গনে পশিয়া সাবধানে
তব দীপহীন কক্ষে সুখদুঃখ-জন্মমরণের
ফিরিয়াছে গোপন সন্ধানে।

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর,
চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ
তোমার নিখিললুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।

জগতের সেই-সব যামিনীর জাগরূকদল
সঙ্গীহীন তব সভাসদ্
কে কোথা বসিয়া আছে আজি রাত্রে ধরণীর মাঝে
গণিতেছে গোপন সম্পদ—
কেহ কারে নাহি জানে, আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধচ্ছবি—
হে শর্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রত সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি।

১৩০৬

অনবচ্ছিন্ন আমি

আজি মগ্ন হয়েছিনু ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে,
যখন মেলিনু আঁখি হেরিনু আমারে।
ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল দেখিলাম তুলি,
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি।
অনন্ত আকাশতলে দেখিলাম নামি,
আলোক-দোলায় বসি দুলিতেছি আমি।
আজি গিয়েছিনু চলি মৃত্যুপরপারে,
সেথা বৃদ্ধ পুরাতন হেরিনু আমারে।
অবিচ্ছিন্ন আপনারে নিরখি ভুবনে
শিহরি উঠিনু কাঁপি আপনার মনে।
জলে স্থলে শূন্যে আমি যত দূরে চাই
আপনারে হারাবার নাই কোনো ঠাঁই।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি।

১৩০৬

জন্মদিনের গান

বেহাগ। চৌতাল

ভয় হতে তব অভয়-মাঝারে
নূতন জনম দাও হে!
দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে,
সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হইতে নবীন জীবনে
নূতন জনম দাও হে!

আমার ইচ্ছা হইতে হে প্রভু,
তোমার ইচ্ছা-মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে হে প্রভু,
তব মঙ্গল-কাজে—
অনেক হইতে একের ডোরে,
সুখদুখ হতে শান্তিক্রোড়ে,
আমা হতে নাথ, তোমাতে মোরে
নূতন জনম দাও হে!

পূর্ণকাম

কীর্তন

সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েছ !
সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ !
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তিবাঁধনে !
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে !
তুমি যে আমার কত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে !
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে !
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে !

পরিণাম

ভৈরবী। ঝাঁপতাল

জানি হে, যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আমি তব অমৃত-দুয়ারে।
জানি হে, তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে।
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে।
জানি হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়ান-সমুখে।
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে।
জানি হে জানি, জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশ-ভয়-পাথারে—
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে।

১৩০৬

—

গ্রন্থপরিচয়

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, শ্রীযুক্ত সমীরচন্দ্র মজুমদার, ইঁহাদের সৌজন্যে কল্পনার অনেকগুলি কবিতার পাণ্ডুলিপি দেখিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, এবং এই-সকল পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া কল্পনার নূতন সংস্করণে অনেক কবিতা-রচনার স্থানকাল নির্দেশ করা বা তৎসম্পর্কিত দু-একটি ভ্রম সংশোধন করা সম্ভব হইয়াছে।

'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' কবিতাটি কল্পনা হইতে বাদ পড়িয়াছিল। উহা নূতন সংস্করণে পুনঃসন্নিবিষ্ট হইল।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে 'অশেষ' ও 'বর্ষশেষ' কবিতা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

এর ['এবার ফিরাও মোরে' কবিতা-রচনার] পর থেকে বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সংঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের, তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছয় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়।··· এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান, কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়।··

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিরোধবিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল! এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কি-

রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।

—আত্মপরিচয়

'বর্ষশেষ' কবিতা সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি। এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে— ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনিভাবে চিরনবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল। বললুম— অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই-যে এত দিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হল না। যে আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায় তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে তার ভিতকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে।

—শান্তিনিকেতন পত্র

'বৈশাখ' কবিতা সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রের উত্তরে, ৪ কার্তিক ১৩৩৯ তারিখে, কবি তাঁহাকে লিখিয়াছেন—

এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত-কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার 'বৈশাখ' কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। বলা বাহুল্য, এটা শেষ-জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত-কিছু···

'বৈশাখ' কবিতার মধ্যে মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম সেদিন চারি দিক থেকে বৈশাখের যে তপ্ত রূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই দিনটিকে যদি ভূমিকারূপে ওই কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরতে পারতুম তা হলে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠত না।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নীচের দুটি লাইন নিয়ে—

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে!

খোলা জানালায় বসে ওই ছায়ামূর্তি অনুচরদের স্বচক্ষে দেখেছি, শুষ্ক রিক্ত দিগন্তপ্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হু হু করে ছুটে আসছে ঘূর্ণানৃত্যে, ধুলোবালি শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেছি, পড়ে দেখো।

তার পরে এক জায়গায় আছে—

সকরুণ তব মন্ত্র-সাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব-'পরে।

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েছ। সেদিনকার বৈশাখমধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল ব'লেই ওটা লিখতে পেরেছি। ধু ধু করছে মাঠ, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, কাছে আমলকী গাছগুলোর পাতা ঝিল্‌মিল্ করছে, ঝাউ উঠছে নিশ্বসিত হয়ে, ঘুঘু ডাকছে স্নিগ্ধ সুরে— গাছের মর্মর, পাখিদের কাকলি, দূর আকাশে চিলের ডাক, রাঙা মাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে মন্থরগমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্ত স্বর, সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে সে-একটি বিশ্ব-

ব্যাপী করুণার সুর উঠতে থাকে, নিঃসঙ্গ বাতায়নে বসে সেটি শুনেছি, অনুভব করেছি, আর তাই লিখেছি।

বৈশাখের অনুচরীর যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয় তো কী? নৃত্যের ভঙ্গি দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি বলছ, তুমি তার ধ্বনি শুনেছ। কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণিগতিটাকে দেখেছি সেখান থেকে কোনো শব্দই পাই নি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায়, তার রূপ নয়, তার গতিই অনুভব করি; তার শব্দ তো শুনিই নে। এ স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জো নেই।

—

প্রথম ছত্রের সূচী